প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে কতটা এগিয়ে নিচ্ছে ডাক বিভাগ

রাজধানীর মণিপুরিপাড়ার আলমগীর সাত্তারের তিন সন্তান দেশের বাইরে থাকতেন। সন্তানেরা ছাড়াও অফিসসহ নানা জায়গার চিঠি আসত। তাই দিনে একবার বাসার ডাকবাক্সটি খুলে দেখা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এরপর একে একে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করল দুনিয়া। সেই দৌড়ে শামিল বাংলাদেশও। বাক্সটি ধীরে ধীরে খালি হতে লাগল। বাড়ির তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শে বছর পাঁচেক আগে তিনি বাসার ডাকবাক্সটি খুলে ফেলেন। কারণ, চিঠি আর আসে না।

আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কেউ আর ব্যক্তিগত চিঠি লেখে না। দাপ্তরিক কাগজপত্রও অনেকটা ই-মেইলনির্ভর হয়ে গেছে। বাসার সামনে যেসব ডাকবাক্স ছিল, সেগুলো আর বাসিন্দাদের কাজে আসছে না। রাজধানীর সড়কে যেসব চিঠির বাক্স ছিল, সেগুলো এখন হয় জরাজীর্ণ, না হয় তুলে নেওয়া হয়েছে। ডাক বিভাগের মেট্রো সার্কেল ঢাকা থেকে জানা যায়, মহানগরে এখন ১১৮টি চিঠির বাক্স আছে। এগুলো তেমন কাজে লাগে না। সড়ক সংস্কারসহ নানা কারণে এগুলো তুলে নেওয়া হচ্ছে।

ডাক বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চিঠির যোগাযোগের নিদর্শন পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে ডাকের নানা সেবার উন্নতি ঘটে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ডাকের কোনো না কোনো সেবা জড়িয়ে আছে। ডাক সম্পর্কিত চিঠি, পোস্টমাস্টার বা ডাকহরকরারা বিখ্যাত কবি–সাহিত্যিকদের লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে। কারণ, এই ডাকব্যবস্থা তখন জীবনেরই অংশ ছিল। হাতে বল্লম, হারিকেন, ঘণ্টি এবং কাঁধে চিঠির বস্তা ছিল ডাক-হরকরা বা রানারের চিরাচরিত দৃশ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ডাকঘর* নাটকের অমল বড় হয়ে রাজার ডাক-হরকরা হতে চেয়েছিল। কারণ, ওই কাজটাই তার ভালো লাগে। আবার তারাশঙ্করের ডাক-হরকরা দীনুর কাঁধে সরকারি ডাক, কত লোকের চিঠি। তার ছুটে চলার গতি এক মিনিট স্থির হলে হাজার হাজার লোকের ক্ষতি হবে। এ আশঙ্কায় দীনুর কিছুটা ভয় হতো, আবার গৌরবও অনুভূত হতো। আজকাল আর বল্লম, হারিকেনসহ ডাক-হরকরাদের ছুটতে হয় না। এখন তাঁদের কাজের ধরন পাল্টেছে।

ডাকপিয়ন, ডাকহরকরাদের কাজের ধরন পাল্টেছে

৩৬ বছর ধরে হরিপদ চন্দ্র দাস (৫৬) মোহাম্মদপুর সাব-পোস্ট অফিসে কাজ করছেন। চাকরির শুরুর দিকে সকাল ৮টায় অফিসে আসতেন, ১০টার মধ্যে চিঠি বিলি করতে বের হয়ে যেতেন। ফিরতে ফিরতে বিকেল ৫টা বেজে যেত। হেঁটে, রিকশায় তিনি চিঠি বিলি করতেন। তাঁর চিঠিপত্র বিলির এলাকা মোহাম্মদপুর ও আগারগাঁও।

হরিপদ বললেন, দাপ্তরিক চিঠির পাশাপাশি ব্যক্তিগত চিঠি, মানি অর্ডার, পার্সেল, বিমার চিঠি বিলি করতে তিনি বের হতেন। এখনো তিনি চিঠি বিলি করতে যান, তবে আগের মতো পরিস্থিতি নেই। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে বের হলে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যায়। তবে তাঁর নতুন কর্ম এলাকা যুক্ত হওয়ায় কাজের পরিধি বেড়েছে।

হরিপদ এখন সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক চিঠিই বেশি বিলি করেন। সঙ্গে কিছু পার্সেলও থাকে। আগে দিনে ৪০টির মতো মানি অর্ডার থাকত। মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবা, অনলাইন ব্যাংকিংয়ের যুগে এখন মানি অর্ডার নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে রানার বা ডাকহরকরাদের কাজের ধরন আমূল পাল্টে গেছে। এখন তাঁদের চিঠির বোঝা নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয় না। সড়কব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে, ডাক বিভাগের গাড়ি রয়েছে।

ঢাকা জিপিওর ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ *প্রথম আলো*কে বলেন, এখনো রানাররা আছেন। ডাকের গাড়িতে চালকের সঙ্গে রানার থাকেন। এ ছাড়া দেশের প্রত্যন্ত এলাকায়ও ডাকঘর রয়েছে। কোনো এলাকায় গাড়ি চলার পথ না থাকলে রানাররা চিঠির বোঝা নিয়ে নির্দিষ্ট ডাকঘরে পৌঁছে দেন।

পোস্ট অফিসে কী হয়

সম্প্রতি রাজধানীর মোহাম্মদপুর সাব–পোস্ট অফিসে গিয়ে দেখা যায়, ভবনের নিচতলায় চিঠিপত্র ও পার্সেল বিভাগে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বেশ কম। অন্যদিকে দোতলায় ডাক জীবনবিমা, সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র বিভাগে বেশ ভিড়।

পোস্ট অফিসের কর্মকর্তারা বললেন, ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার কিছু এখনো হয়। এ ছাড়া দিনে গড়ে ২০০-এর মতো পার্সেলের বুকিং হয়, চিঠিপত্র হয় ৪০০-এর মতো। তবে চিঠির প্রায় সবই দাপ্তরিক।

ডাক বিভাগ সূত্র বলছে, সারা দেশে এখনো ৯ হাজার ৯৭৪টি ডাকঘর সচল রয়েছে।

সেবা নেওয়া কমেছে

ডাক বিভাগ মূলত দুই ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। এতে মূল সেবার মধ্যে আছে সাধারণ চিঠিপত্র, রেজিস্টার্ড চিঠিপত্র, জিইপি, ইএমএস, মানি অর্ডার, পার্সেল সেবা, ভিপিপি, ভিপিএল, ডাকটিকিট, ডাকদ্রব্য গ্রহণ, প্রেরণ ও বিলি, ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার, ক্যাশ কার্ড, স্পিড পোস্ট।

অন্যদিকে এজেন্সি সেবার মধ্যে আছে ডাক জীবনবিমা, সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, পোস্টাল অর্ডার, নন-পোস্টাল টিকিট মুদ্রণ ও বিতরণ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ডাক বিভাগের চিঠি ও পার্সেল ইস্যুর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৫৪ লাখ ৫৬ হাজার ৭৫৭; যা ২০২১-২২ অর্থবছরে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটিতে।

ডাক অধিদপ্তরের অন্যতম একটি সেবা হচ্ছে মোবাইল মানি অর্ডার (ইএমটিএস)। আগের তিন অর্থবছরে লাখের বেশি ইএমটিএস ইস্যু হলেও গত অর্থবছরে তা কমে ৯২ হাজারে দাঁড়ায়।

বিদেশে দ্রুত মেইল বা ডাক পাঠানো—ইএমএস সেবা দেয় ডাক অধিদপ্তর। বিশ্বের ৪৬টি দেশের সঙ্গে ডাক বিভাগের এ সেবা চালু আছে। পাঁচ বছর আগে ইএমএসে পার্সেল গিয়েছিল ৫৫ হাজার ৬৮৯টি। সর্বশেষ অর্থবছরে তা কমে হয়েছিল ২৩ হাজার ৯৫৪টি।

এ বিষয়ে ডাক বিভাগ তাদের লিখিত বক্তব্যে *প্রথম আলো*কে জানিয়েছে, করোনাকালে তাদের সেবা কিছুটা কমেছিল, তবে তা বাড়তে শুরু করেছে।

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের পোস্টাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিবেদন ২০২২ অনুযায়ী, বিশ্বে ২০১৯ থেকে ২০২১ সালে পার্সেল সেবা ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ সময়ে চিঠি সেবা কমেছে ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ। করোনা মহামারিতে ই-কমার্সের চাহিদা বেড়ে যাওয়া পার্সেল সেবার বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলেছে। তবে বাংলাদেশের ডাক বিভাগ ই-কমার্স বৃদ্ধির এ সুফল পায়নি।

চিঠিপত্র, পার্সেল সেবায় দেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতা দুটোই বেড়েছে। বিশেষ করে ডিজিটাল কমার্সের প্রসার হওয়ার পর থেকে পার্সেল ও ডেলিভারি এখন প্রয়োজনীয় সেবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এসব সেবার ক্ষেত্রে প্রেরকের কাছ থেকে চিঠি বা পার্সেল সংগ্রহ করে প্রাপকের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। কারণ, শহুরে জীবনে ট্রাফিক ঠেলে কেউই কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পণ্য পাঠাতে এখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কিন্তু ডাক বিভাগের সে নীতি নেই। কেউ কিছু পাঠাতে চাইলে তাকে ডাকঘরে যেতে হবে। এ বিষয়ে ডাক বিভাগের কর্তারা বলেন, ডাক বিভাগের নীতি অনেক পুরোনো। চাইলেই এক দিনে কোনো কিছু পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সূচকে প্রতিবেশী দেশেরও পেছনে

ডাকের সুদিন আর আগের মতো নেই। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ডাকসেবার আধুনিকায়ন ও মান বাড়লেও বাংলাদেশে হয়নি। ইউপিইউর ২০২২ সালের সমন্বিত ডাক উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৭২টি দেশের ডাক উন্নয়ন পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে চারটি সূচক—আস্থা, পৌঁছানো, প্রাসঙ্গিকতা ও সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে একেকটি দেশের স্কোর ও ধাপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সমন্বিত ডাক উন্নয়ন সূচকে ১৩ দশমিক ৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় ধাপে অবস্থান করছে। চারটি সূচকের মধ্যে আস্থায় ১৬ দশমিক ৩, পৌঁছানোয় ১৫ দশমিক ১, প্রাসঙ্গিকতায় ১ দশমিক ৭ ও সহনশীলতায় ২০ দশমিক ৭ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ।

এই তালিকায় বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে প্রতিবেশী নেপাল (১৪ দশমিক ৮), মিয়ানমার (১৫ দশমিক ১), পাকিস্তান (৪৬ দশমিক ২), ভারত (৫৭ দশমিক ৩) ও শ্রীলঙ্কা (৩৩ দশমিক ৬)।

দ্বিতীয় ধাপে থাকা দেশ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব দেশ মূলত অপারেশনে (কার্যক্রম) বেশি মনোযোগ দেয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ভালো করতে হলে তাদের ডাক পরিষেবা ও ব্যবসায়িক মডেলের উন্নতি করতে হবে।

বাংলাদেশের অবনমন অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৪তম এবং স্কোর ছিল ৩৫ দশমিক ৫৪। ২০১৯ সালে স্কোর ছিল ২০ দশমিক ২০ এবং ১৭২টি দেশের মধ্যে অবস্থান ছিল ১১৭তম। পয়েন্ট কমেছে আগের বছরের চেয়ে ১৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। ২০২০ সালে অবস্থান ছিল ১২৮তম, স্কোর ১৫ দশমিক ৮০ এবং ২০২১ সালে স্কোর ১০ দশমিক ২ শতাংশ এবং অবস্থান ১৪৩তম।

ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে স্কোর কিছুটা বেড়েছে। এই বৃদ্ধি বলে দিচ্ছে, ডাক বিভাগ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রায় সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশ ভিয়েতনাম। ইউপিইউর সূচকে ভিয়েতনামের স্কোর ৪৬ দশমিক ৫ এবং তারা সমন্বিত ডাক উন্নয়ন সূচকে লেভেল ৫-এ অবস্থান করছে।

গতানুগতিক সেবার বাইরেও তারা সেবার পরিসর বাড়িয়েছে। ভিয়েতনাম পোস্টের রয়েছে নন–লাইফ ইনস্যুরেন্স সেবা, বিভিন্ন পরিষেবার বিল থেকে শুরু করে ট্রাফিক জরিমানা, পাসপোর্ট ও আইডি ফি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি, মামলার ফি, ট্যাক্স ফি, এয়ার টিকিট বুকিং ফি।

এর বাইরে ভিয়েতনামের ডাক বিভাগ বিজ্ঞাপন পরিষেবা, টেলিকমিউনিকেশনের আইটি পরিষেবা, ব্যাংক এজেন্ট সেবা দিয়ে থাকে। পোস্টমার্ট ডট ভিএন নামে তাদের একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মও আছে, যেখানে নিত্যপণ্য থেকে শুরু করে অনেক কিছুই বিক্রি হয়।

আয়-ব্যয়ের ব্যবধানে বিস্তর ফারাক

বেশির ভাগ সময়ে ডাক বিভাগের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ছিল। তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন ঘেঁটে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে ডাক বিভাগের আয় ছিল প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ টাকা। সে বছর ব্যয় ছিল ২ কোটি ৭১ লাখ টাকা। পরের বছরগুলোতে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের ব্যবধান বাড়তে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ডাক বিভাগের ব্যয় ৯৩৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। অথচ এই অর্থবছরে তাদের আয় ২৩০ কোটি ৫ লাখ টাকা। তাদের বেতন–ভাতার (৪৪১ কোটি ৭১ লাখ) চেয়ে এই আয় কম। আবার প্রতিবছর ডাক বিভাগে কর্মীদের পেনশন ও আনুতোষিক ব্যয় ৩০১ কোটি টাকার বেশি।

পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, আয়-ব্যয়ের ব্যবধান বছর বছর বড় হচ্ছে। ব্যয়ের বড় অংশই যাচ্ছে বেতন-ভাতা ও পেনশনের পেছনে। কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারি বেতনকাঠামো বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয়ও বেশ বড় হয়েছে।

আয়-ব্যয় প্রসঙ্গে লিখিত বক্তব্যে ডাক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। লাভ-ক্ষতি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

ডাকের রাজস্ব আয় কমছে কেন—এমন প্রশ্ন রাখা হয়েছিল বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তার কাছে। তাঁরা বলেন, ডাক বিভাগের প্রাইজবন্ড, স্ট্যাম্পসহ কিছু সেবা আছে, যেখান থেকে কোনো রাজস্ব আসে না। ডাকসেবার উন্নয়নে উচ্চপর্যায় থেকে মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। ডাকসেবা উন্নত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব রয়েছে।